সরল গরল

মিজানুর রহমান খান

নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও এর প্রভাব

প্রথম আলো

১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তন যে কোনো বিপ্লবী পরিবর্তন নয়, সাধারণ আটপৌরে শাসকমার্গীয় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের ফসল, তা যখন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, তখন আমরা একজন নতুন প্রধান বিচারপতি পেলাম। তাঁকে স্বাগত জানাই। তাঁর সততা সুবিদিত। তিনি তাবলিগ জামাতের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। তাঁর পুরো নাম মির্জা মোহাম্মদ রুহুল আমিন। এখন কথা হলো, নতুন প্রধান বিচারপতির নিয়োগ আদালতের অঙ্গনে কী প্রভাব বয়ে আনবে।

রায়ের গুণগত মান আইনজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তার গুণগত মানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এটাই সত্য যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় উন্নত করার জন্য যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার নিদর্শন বারের দিক থেকে দেখানো কাম্য, তার লক্ষণ পুরোপুরি অনুপস্থিত। এবং অদূর ভবিষ্যতেও তেমন কিছুর উত্তরণ আমরা আশা করতে পারি না।

প্রধান বিচারপতি মো. রুহুল আমিনকে বিদায় সংবর্ধনা না দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বারের সিদ্ধান্ত ওজন করা হলে পাল্লায় ভারী হবে দলীয়, গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার বিষয়। বার সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আইনজীবী। সমিতির সম্পাদক নূরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় জেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আওয়ামী লীগের টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁদের এই পরিচয় দেওয়া প্রাসঙ্গিক হয়, যখন তাঁদের সার্বিক ভূমিকাকে কোনো দল ও গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার অব্যাহত প্রয়াস থেকে একেবারেই আলাদা করা যায় না। আমাদের দলীয় রাজনীতিকেরা বার-বেঞ্চের ভালো-মন্দ নিজেদের স্বার্থের নিরিখে বিবেচনায় বরাবরই অভ্যস্ত। সুপ্রিম কোর্ট বারের বিভক্ত নেতারা সাধারণত সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের কথা স্মরণ করতে পারি না।

প্রধান বিচারপতি হিসেবে এম এম রুহুল আমিনকে নিয়োগ দিতে জ্যেষ্ঠতার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। এই নীতি অলিখিত, রেওয়াজ হিসেবে চলে আসছে। বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের নিয়োগ দুটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রথমত, বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই হবেন পুরোদস্তুর সার্ভিস ক্যাডারের প্রথম বিচারক, যিনি প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। 'পুরোদস্তুর' কথাটি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীকে স্মরণ করে বলা। কারণ সাহাবুদ্দীন আহমদ সিএসপি হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করে সরকারের রোষানলে পড়ে অতিরিক্ত জেলা জজ হয়েছিলেন।

আর বিচারপতি মাহমুদুল আমিন দীর্ঘদিন ওকালতি করে সরাসরি অতিরিক্ত জেলা জজ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে বিচারপতি রুহুল আমিনই নিম্ন আদালত থেকে উঠে আসা প্রথম প্রধান বিচারপতি। এবং আরও একটি মানদণ্ডে তিনিই প্রথম প্রধান বিচারপতি, যাঁকে নিয়োগ দিতে জ্যেষ্ঠতার নীতি প্রথমবারের মতো অগ্রাহ্য করা হলো। আওয়ামী লীগ বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেনকে হাইকোর্ট বিভাগে রেখে তাঁদের কনিষ্ঠদের আপিল বিভাগে আনে। বিএনপি এসে এর 'প্রতিকার' করে। তবে বিচার বিভাগ পৃথক্করণ কার্যকর ও সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে গতিশীল করতে যে বিচার বিভাগীয় রাষ্ট্রনায়কোচিত বিবেচনা (ঔঁফরপরধষ ংঃধঃবংসধহংযরঢ়) দরকার, তার বিরাট শূন্যতা চলছে বহু বছর ধরেই। সুপ্রিম কোর্টকেন্দ্রিক সংস্কারের অনেক কাজ সামনে।
বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বলতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ কোনোটির ক্ষেত্রেই হাত দেননি। এবং এ ব্যাপারে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতির কাছে খুব বেশি কিছু আশা করা সংগত হবে কি না, তা নিয়ে আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কম নয়।

সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম তাঁর দেওয়ানি কার্যবিধিসংক্রান্ত বইয়ের ভূমিকায় একজন প্রধান বিচারপতি কী করে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কর্মকর্তার সঙ্গে একজন আইনজীবীর তর্কে অসংগতভাবে কর্মকর্তার পক্ষ নেন তা উল্লেখ করেন। বিচার প্রশাসনে বিও বা বেঞ্চ অফিসারদের একটা শক্ত অবস্থান রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা তাঁদের কাছে জিম্মি। প্রধান বিচারপতিরা আসেন-যান, তাঁরা জবাবদিহির উর্ধ্বে থাকেন। বিওদের সম্পদের হিসাব চাওয়া হলে অনেকে বিস্মিত হতে পারেন।

নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি সার্ভিস ক্যাডারের হওয়ায় অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্যে একটি উদ্দীপনা স্বাভাবিক। প্রথাগতভাবে বার ও ক্যাডার থেকে আসা বিচারকদের মধ্যে একটা স্নায়ুপীড়ন বিদ্যমান। বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগের ৬১ বিচারপতির মধ্যে ১৯ এবং আপিল বিভাগের ছয়জনের মধ্যে দুজন বিচার ক্যাডারের। বার-বিচারকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবেন। যুক্তি হলো নিম্ন আদালতের বিচারকেরা একটা সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে জজিয়তি করেন। এই বলয়ের বাইরে তাঁরা কমই আসতে পারেন। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি উত্তরাধিকারসূত্রে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি পাবেন, তা সিন্ডিকেটজনিত। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে গত ২৪ মে প্রথম আলোতে প্রকাশিত পদোন্নতিবিষয়ক গুরুতর অনিয়ম সংঘটনের অভিযোগের সম্পর্ক রয়েছে। পৃথক্করণের পরে নিম্ন আদালতের গণবদলি এবং পদোন্নতি প্রদানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। খেয়াল-খুশিমাফিক বিচারক বদলি এখনো চলছে। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি যেমন, তেমনি ফুল কোর্টও এর দায়দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রারকে অপসারণে হাইকোর্ট বিভাগের সকল বিচারক নিয়ে গঠিত ফুল কোর্টের অধিকাংশ মাননীয় সদস্য সুপারিশ করলেও বিদায়ী প্রধান বিচারপতি ব্যবস্থা নেননি। বিচারপতি ফজলুল করিম প্রধান বিচারপতি হতে পারেন, তেমন শঙ্কা ওই 'সিন্ডিকেট'-এর তরফে ছিল। বিচারপতি ফজলুল করিম প্রকাশ্য সভায় রেজিস্ট্রারের অপসারণে বিদায়ী প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের বিষয়টি বিদায়ী প্রধান বিচারপতির হাতেই সম্পন্ন করার একটা জোর চেষ্টা ছিল। ওই সিন্ডিকেট সদস্যদের অনেকের নাম ছিল সম্ভাব্যদের তালিকায়। নিম্ন আদালত অঙ্গনের জ্বলন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, সিন্ডিকেটের খুঁটির জোর কতটা শক্ত? এটা মনে করার সংগত কারণ রয়েছে যে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রদানে ফুল কোর্ট বা জিএ কমিটির পরিবর্তে, চূড়ান্ত কার্যকর ক্ষমতা কেবল প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে হাইকোর্ট রুলস সংশোধনের অগতান্ত্রিক ও অদ্ভুত প্রস্তাবের নেপথ্যে সিন্ডিকেট সক্রিয় ছিল। একজন বিচারকের পদোন্নতি ও বদলি ফুলকোর্টের একাধিক বৈঠকে বিশেষ তাগিদে নিশ্চিত করার পরও দুই মাস ধরে তা ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। ওই সিন্ডিকেটের কত হিম্মত, তা অনুমানের জন্য এই একটি উদাহরণ যথেষ্ট।

বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মো. রুহুল আমিন নিম্ন আদালত ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে ফুল কোর্টের চাপের মুখে ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পদের কারণে তাঁর কাঁধেই দায়দায়িত্ব বর্তেছে। বাস্তবে বহু প্রশ্নবিদ্ধ প্রশাসনিক ফাইলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন রেজিস্ট্রার, প্রধান বিচারপতি কেবল অনুমোদন করেছেন। বিদ্যমান এই অব্যবস্থার শিকড় উপড়াতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ভারপ্রাপ্ত আইনসচিব নিয়োগ প্রশ্নে সংস্থাপন ও আইন মন্ত্রণালয়কে দুই ধরনের চিঠি প্রদানের মতো বিস্ময়কর ঘটনার তদন্তে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের রায় আপিল বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতির সামনে দুটো বিকল্প। এক. বিদায়ী প্রধান বিচারপতি তথা সংশ্লিষ্ট স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর 'ভাবমূর্তি' বিবেচনায় ওই তদন্ত না করা। দুই. আদালতের রায় মানার দৃষ্টান্ত স্থাপন ও বিচার বিভাগের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তদন্ত করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান বিচারপতিরা প্রশাসনিক সংস্কারে খুব সময় পাননি। কারণ, তাঁদের মেয়াদ ছিল অল্প। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি তাঁর পূর্বসূরির বর্ণিত 'মহাপ্রলয়ের' কালব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করেন কিংবা ২০০৩ সালে প্রণীত আচরণবিধির শর্ত অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের কাছে সম্পদের বিবরণী চান কি না, দুদকের উদ্যোগে অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পদের যে বিবরণী নেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তিনি কোনো প্রক্রিয়া শুরু করেন কি না, বেঞ্চ অফিসারসহ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণী তিনি চাইবেন কি না, বেঞ্চ গঠন ও পুনর্গঠনে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন কি না, আমরা তা লক্ষ করব। ঢাকায় একটি বাড়ি থাকলে কেউ সরকারি প্লটের হকদার নন, কিন্তু অনেক প্রভাবশালী হলফ করে তথ্য গোপন করে প্লট নিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, তাই বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ব্যাপারে এ বিষয়ে অভিযোগ এলে তদন্ত হবে কি হবে না? তথ্য গোপন করে প্লট নিয়ে থাকলে তাঁরা হয় তা ফেরত দেবেন, না হয় রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিষয়ে জনমনের সংশয় দূর করতে যথা উদ্যোগ নিতে নতুন প্রধান বিচারপতির নৈতিক জোর আছে।

১১ জানুয়ারির পর প্রভাবশালী বাদীদের পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ আইনি প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন এবং আপিল বিভাগ তা উল্টে দিয়েছেন বলেই সুপ্রিম কোর্ট বার আজ রুষ্ট। সেদিক থেকে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি কিন্তু একটি পুরোনো নিয়মে হাত না দিয়ে প্রকারান্তরে ওই বিশেষ শ্রেণীর বাদীদের কার্যকর উপকারই করে গেছেন। একদিন জামিন না পাওয়ার দুঃখ তাদের ঘুচবে!

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাতে ২৯ মে শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোর শিরোনাম হলো: 'বিশেষ আদালত ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচকে দুর্বল করেছে'। এই রাজনৈতিক বক্তব্যে অর্ধসত্য ফুটে উঠেছে। অ্যামনেস্টি এটা দেখার চেষ্টা করেনি যে দুর্নীতির দায়ে বিশেষ আদালতে দণ্ডিত প্রভাবশালীদের আপিলের আবেদনের শুনানির গতি এত মন্থর কেন? এটা ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচকে কি দুর্বল

করেনি? অ্যামনেস্টির খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি কেন? হাইকোর্টের রুলস বলেছে, 'আপিল আবেদনের পর হাইকোর্টে তা শুনানির জন্য পেপারবুক তৈরি করবেন রেজিস্ট্রার।' কিন্তু সরকার চায়নি বলেই এই পেপারবুক তৈরিতে ঢিলেমি দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মামলায় নিম্ন আদালতে দণ্ডিতদের তরফে প্রায় ২৫টি আপিলের বিপরীতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের গরজে একটি পেপারবুকও তৈরি হয়েছে বলে জানা যায় না। পেপারবুক না করে ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচকে যেভাবে ধসিয়ে দেওয়া হলো, তার দায়দায়িত্ব বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এড়াতে পারেন কি?

বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনকে প্রধান বিচারপতি করার ফলে বিচারপতি ফজলুল করিমের সম্ভাবনা উবে যায়নি। বিচারপতি করিম অবসর নেবেন ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠতার নীতি কেন অগ্রাহ্য করা হলো, তার কারণ বলা উচিত। কয় দিন আগে বিচারপতি করিমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগসংবলিত একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। আগেই অভিযোগ ছিল, তিনি কে এম হাসানের মেয়াদে প্রধান বিচারপতি হতে উদগ্রীব ছিলেন। বিদায়ী প্রধান বিচারপতির সংবর্ধনায় ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদের একটি উক্তি ভীষণ আলোচিত হয়। তিনি বলেছিলেন, "মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনি পদের জন্য তদবির করেননি, রায় লিখে কারও নজর কাড়তে 'ভি' চিহ্ন দেখাননি। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংগ্রহ করেননি।" এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন ফজলুল করিম। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি ফজলুল করিম দুজনেই বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় রায়দানকারী। রায়দান শেষে বিচারপতি করিম প্রকাশ্যে 'ভি' চিহ্ন দেখান। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন, কিন্তু হঠাৎ সনদ সংগ্রহ করায় মনে হয় তিনি আওয়ামী লীগের নজর কাড়তে চেয়েছিলেন। তবে যদি যুক্তি দেওয়া হয়, তিনি শারীরিকভাবে অসমর্থ, তাহলে এই প্রশ্নের জবাব দরকার যে তিনি যদি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হতে পারেন, যদি আপিল বিভাগের এজলাসে হররোজ বসতে পারেন, তাহলে তিনি কেন কেবল প্রধান বিচারপতি হতেই অযোগ্য থাকবেন? আবার আপিল বিভাগের একজন বিচারক হয়ে তিনি কেন চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে থাকবেন? সত্য বটে, বিচারপতি মোর্শেদ, বি এ সিদ্দিকী এবং এম এ ইস্পাহানি ঢাকা ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। যে মহল ঢাকায় তাঁর দুটি বাড়ি ও অন্যান্য প্রশ্ন সামনে এনেছে, তাঁরা আসলে কী চান? এর আগে বলা হয়েছিল তিনি 'সৎ ও দক্ষ।' এখন তো মনে হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যেন অদৃশ্য কিছু হলেও পাওয়ার আশায়।

আমরা কিন্তু সেকারণেই বলে আসছি, প্রধান বিচারপতি বাছাই প্রক্রিয়াও কমিশনের ভেতর দিয়ে যাওয়া উচিত। এতে সব পক্ষের তরফেই স্বচ্ছতা বা নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ঘাটতি লিফলেট-সংস্কৃতি ডেকে আনে।
নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অবসরে যাবেন। কিন্তু সংস্কারের জন্য তিনি তাঁর সময়কে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেনই, তা আপাতত বলা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজাতে আপিল বিভাগের বাইরে থেকে কাউকে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রধান বিচারপতি করা উচিত। যাঁরা ভেতর থেকে প্রধান বিচারপতি হন, তাঁদের কারো এক ধরনের গর্ব ও বীতরাগ (প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস) থাকতে পারে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে, স্বজনপ্রীতির জাদু থেকে যেন তাঁদের বেরোনো কঠিন, কিন্তু সুশাসন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিচার বিভাগীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

আমরা আসলে প্রধান বিচারপতির কাছে বেশি বিচারকাজ চাই না। এই পদটি ঢের বেশি প্রশাসনিক। তাই চাই একজন বিচার বিভাগীয় নেতা। নতুন প্রধান বিচারপতির সামনে মামলার পাহাড়। হাইকোর্টে আড়াই লাখের বেশি। আপিল বিভাগে সাড়ে ছয় হাজার। নিম্ন আদালতে পৌনে চার লাখ। বিচার বিভাগ পৃথকের পর সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় হবে কি না, ফুল কোর্টের ভূমিকা কী হবে তার মীমাংসা জরুরি ভিত্তিতে কাম্য। সুতরাং প্রধান বিচারপতি বিরল ক্ষেত্রেই এজলাসে বসার রেওয়াজ চালু করতে পারেন। প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে বিচার বিভাগ পৃথক্করণ দিবসে বার ও বেঞ্চের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রাণখুলে মতবিনিময় করেছিলেন।

সিঙ্গাপুরকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে রূপান্তরের রূপকার লি কুয়ান ১৯৯০ সালে ব্যারিস্টার টার্নড ব্যাংকার ইয়ং পাঙ হোকে প্রধান বিচারপতি করে যে সুফল পেয়েছেন, তার ইতিহাস বিশ্ব জানে। এ পদে মি. ইয়ং সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ ১৬ বছর। ১৯৯০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি প্রধান বিচারপতি হয়েই 'মাইলর্ড' বলার মতো ঔপনিবেশিক প্রথার বিলোপ ঘটান। উচ্ছেদ করেন উইগ (বিচারপতিরা শপথ নেওয়ার সময় মাথায় যা পরেন)। মামলাজট নিরসনে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। দ্রুত বিচারের স্বার্থে তিনি নৈশ আদালত বসান। আদালতে প্রযুক্তি আনেন। এমনকি উটকো আপিলকারীকে শাস্তি দানের নিয়ম চালু করেন।

জাতি গঠনের রাজনৈতিক ভিশন রূপান্তরের স্বপ্ন প্রধান বিচারপতির মননেও সুপ্ত থাকতে হবে। দলবাজির এ দেশে এ কথা বলাও ঝুঁকিপূর্ণ, তবু সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটা বোঝানোর জন্য বলি, আব্রাহাম লিংকনের মতো সত্য কথাটা এভাবে কেউ বলেননি যে, সুপ্রিম কোর্ট যখন রাজনৈতিক ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দেন, তখন তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেন। রুজভেল্টের মন্তব্য ছিল, “একজন কনস্ট্রাকটিভ স্টেটসম্যান’ ছাড়া আমি কাউকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের কথা ভাবতেই পারি না।”
প্রধান বিচারপতির পদে একজন ‘কনস্ট্রাকটিভ স্টেটসম্যান’ বড় বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশের।

মিজানুর রহমান খান: সাংবাদিক।
mrkhanbd@gmail.com

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com